কথাশিল্পী শওকত আলী

‘তারাশঙ্করের উপন্যাসে সাঁতার কেটেছি তো বিভূতিভূষণের উপন্যাসে ডুবসাঁতার কাটতে হয়েছে’

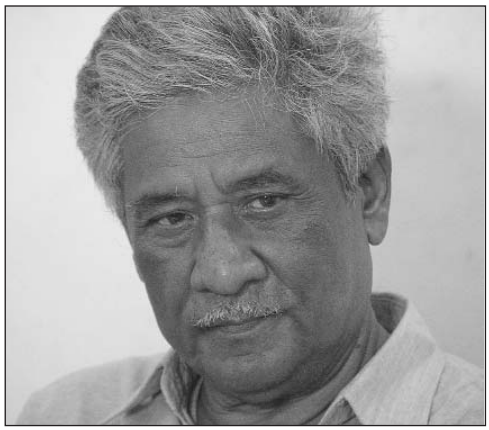

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মারুফ রায়হান**

এখনকার বাংলা কথাসাহিত্যের পাঠকদের কাছে লেখক শওকত আলীর (জন্ম ১৯৩৬) নামটি ব্যাপকভাবে পরিচিত। জীবনকে গভীরভাবে দেখার এবং উপলব্ধি করার স্বাক্ষর তাঁর সকল রচনাতেই লক্ষ্য করা যায়। অতীতের জীবন যেমন প্রায় অনুপুঙ্খ ফুটে ওঠে তাঁর লেখায়, তেমনি বর্তমানের বাস্তবতাও বহুমাত্রিকভাবে তাঁর রচনায় ধরা পড়ে। তৃণমূলের অপরাজেয় সংগ্রামী মানুষদের যেন পাওয়া যায়, তেমনি নগরবাসী বিদ্রোহী তারুণ্যের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কাহিনীও তাঁর রচনায় থাকে। আরও থাকে শোষক ও শোষিতের বহুমাত্রিক সংগ্রামের কথা। তাঁর কাহিনীতে ভালোবাসা ঘৃণা ক্রোধ পরতে পরতে চরিত্র নির্মাণের প্রক্রিয়াকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে।

শিক্ষা : শ্রীরামপুর মিশনারি স্কুল ও রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল। কলেজ শিক্ষা : দিনাজপুরে, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জীবিকা : শিক্ষকতা, স্কুল ও কলেজ, ৩ বছর। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ২৫ বছর। জেলা গেজেটিয়ার সম্পাদনা ৩ বছর। অধ্যক্ষতা : সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয় ৩ বছর। ১৯৯৩-অবসর। পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৮), একুশে পদক (১৯৯১), ফিলিপ্স পুরস্কার (২বার : ১৯৮৬, ১৯৯২), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মৃতি পুরস্কার, ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর সম্মাননা ও গোলাম মোর্তজা স্মৃতি পদক।

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার লেখালেখির সূচনাপর্ব এবং ক্রমশ লেখক হয়ে ওঠা সম্পর্কে জানতে চাই।

শওকত আলী : আমার লেখালেখির আরম্ভ বালক-বয়সে। যখন বই পড়তে পারি এবং লিখতে শিখেছি। বই পড়তে মজা লাগতো, আর পড়েছিও অনেক– যখন তখন, ফাঁক পেলেই– খেলাধুলার চাইতে বই পড়ে বেশি মজা পেতাম। হাতের কাছে বই পেয়েও যেতাম– পত্রপত্রিকাও।

উত্তরবঙ্গের এক থানা টাউন রায়গঞ্জের ক্ষয়ে যাওয়া এক জোতদার পরিবারে জন্ম– ক্ষয়ে যাওয়া বলছি এজন্য যে জমির আয়ে সংসার চলতো না। কিন্তু হলে কী হবে অনেক বই ছিলো বাড়িতে– পত্রপত্রিকাও আসতো। তাছাড়া বাড়ির কাছেই একটা পাবলিক লাইব্রেরি ছিলো, সেখান থেকেও বই আনতেন বাবা। বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মীর মোশাররফ, নজরুল, জসীমউদ্দীন, এঁদের নাম আর কিছু রচনার সঙ্গে তো পরিচয় হয়েছিলোই, তারপরও পরিচয় হয়েছিলো তারাশঙ্কর-বিভূতি, মানিক– এঁদের লেখার সঙ্গেও– এমনকি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, বনফুল, সমরেশ বসু– এঁদের লেখাও একেবারে অপরিচিত ছিলো না। শওকত ওসমানের নামও চেনা হয়ে গিয়েছিলো। বই পেতাম না, কিন্তু পত্রপত্রিকা তো পেতাম। তাছাড়া নামের মিল তো ছিলোই। আমার পরের ভাই ডা. ওসমানের নামও শওকত ওসমানের নাম থেকে নেওয়া। একই লেখকের নাম কাকতালীয়ভাবে দুই ভাইয়ের নাম হয়ে গেছে। আমাদের পরিবারে নাম নিয়ে আরও একটি সাদৃশ্যের ঘটনা আছে।

তো যাক সে প্রসঙ্গ– লেখা শুরুর কথা বলি। ঐ পড়তে পড়তেই আমার লিখতে ইচ্ছা করতো। তাই লিখতামও, কিন্তু কোনোটাই শেষ হতো না। তার আগেই ছিঁড়ে ফেলে দিতাম। কেউ জানতো না আমার এই খাতার পাতা নষ্ট করে লেখা আর ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার কথা। তবে মায়ের নজর এড়াতে পারিনি। তিনি দেখতেন, কিন্তু কিছু বলতেন না। আমার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকতেন। মা মারা যান ১৯৪৯এ– পেটের নাড়িতে ক্যান্সার হয়েছিলো। খুবই যন্ত্রণা হতো। রাতে ঘুমোতে পারতেন না। অন্য ছেলেমেয়ে কাউকে নয়, আমাকেই বলতেন গল্পের বই পড়ে শোনাতে। রাতের পর রাত জেগে শিয়রের কাছে বসে লণ্ঠনের আলোয় আমি মাকে বই পড়ে শুনিয়েছি। তারাশঙ্কর আর বিভূতিভূষণের লেখা মায়ের খুব ভালো লাগতো– ওঁদের প্রায় সব উপন্যাসই পড়া হয়ে যায়। মা ১৯৪৯ এর পহেলা রমজানে চিরবিদায় নেন।

মায়ের ঐ গল্প-উপন্যাসপ্রিয়তা আমার সাহিত্যরুচি ও লেখালেখির একটা কারণ হতে পারে বলে মনে হওয়াতেই প্রসঙ্গটা এখানে তুললাম।

কিন্তু লেখালেখি করে খাতার পৃষ্ঠা নষ্ট এবং ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা আমার ক্লাসের বন্ধুরা কেউ কেউ জানলেও তাদের এব্যাপারে কৌতূহলী হতে দেখিনি। আমার পাগলামির ঘটনা নিয়ে ওদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টাও ওরা কখনো করেনি। বই পড়া, লেখালেখি, বা নিজের মধ্যে ডুবে থাকার আরো একটা কারণ বোধ হয় এই যে, তখন চারদিকে সব কিছু টালমাটাল অস্থির, চারদিকে আতঙ্ক আর আশঙ্কা। ২য় মহাযুদ্ধ শেষ হচ্ছে। দুর্ভিক্ষের ছায়া যেতে যেতেও যায় না– কখন যে দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগে যায় ঠিক নেই। একদিকে স্লোগান ওঠে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান তো অন্যদিকে আরো জোরে তার প্রত্যুত্তরে শোনা যায় ভারতমাতা কি জয়। এমন অবস্থার মধ্যেই দেশভাগ হয়ে গেলো। নোয়াখালী আর কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয়ে গেছে। খুব জোরে শোরে চলছে একদিক থেকে আর একদিকে পালানোর পালা। বাইরে তাকালেই ভয় আর আশঙ্কা, তখন ঘরের দরজা জানালা যেমন তেমনি মনেরও দরজা জানালা বন্ধ করে রাখতে হতো। আর ওই ভয়, আতঙ্কের কথা লিখতে চেষ্টা করতাম। শেষ পর্যন্ত পারিনি; কিন্তু চেষ্টাটা করতাম।

১৯৫২ সালের মাঝামাঝি সময়ে জন্মভূমি ছেড়ে চলে আসতে হয়। মুসলমানদের নতুন দেশ পাকিস্তান-এর পূর্বাঞ্চলের জেলা শহরে দিনাজপুরে। সেখানেই ঠাঁই গাড়া হয়। ওখানকার কলেজেই পড়াশোনা চালু হয়ে যায়। বন্ধুও জোটে। তবে এরা যেন একটু বেশি ঘনিষ্ঠ- যাদের ছেড়ে এসেছি তারা সবাই বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতো না। আসতোও না আমাদের বাড়িতে। কী খাই, কোন বই পড়ি, কীভাবে থাকি এসব খোঁজ খবর নেওয়ার দরকারবোধ করতো না। এরা একেবারে উল্টো। এরা জেনে ফেলে যে আমি লেখালেখি করি। ক্রিকেটের মাঠে যাই বটে। কিন্তু ওরা খেলা দেখে আর আমি ওদের পাশে বসে বই পড়ি। ওদেরই চাপাচাপিতে কলেজের বার্ষিক সাহিত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হয়। প্রথম পুরস্কার পাওয়া গেলে সেই প্রবন্ধ স্থানীয় সাহিত্যপত্রিকায় তা প্রকাশের ব্যবস্থা করে তারাই, অবশ্য একজন স্যার তাদের সাহায্য করেছিলেন। ওদের মধ্যে কেউ কেউ বাসায় এসে আমার খাতা খুলে আমার অসমাপ্ত কবিতা হোক

কি গল্প হোক, পড়তো। ওদেরই চাপে পড়ে ঢাকায় পত্রিকায় কবিতা পাঠানো হয়, গল্পও। কিন্তু দুটি কি একটা লেখা ছাপানো হয়েছিল। বাকিগুলো সম্পাদকদের ছাপার যোগ্য বিবেচিত হয়নি।

১৯৫৪ সালের প্রায় পুরোটাই জেলখানায় কাটে (সম্ভবত এপ্রিল-নবেম্বরে)। ওখানে গ্রামাঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলাপ এবং বন্ধুত্ব দুই-ই হয়- দু'চারজন খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ওদের কাছেই তেভাগার নানান ঘটনার কথা জানতে পারি। ওদের সান্নিধ্য পাওয়াতেই জীবনের একটা বন্ধ দরজা যেন খুলে যায়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বি এ পরীক্ষা দিই এবং কোনো রকমে পাস করি। এমএ পরীক্ষার পরে গ্রামের দিকে গিয়ে স্কুল মাস্টারি করেছি। কলেজের মাস্টারি আরম্ভ করি ঠাকুরগাঁও-এ– তেভাগার লড়াই যে অঞ্চলে হয়েছিল সে অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

ওই রকম ঘোরাঘুরি করতে করতেই যা দেখি, যা শুনি, যা বুঝি সবই লিখতে ইচ্ছে করতো। লিখতামও কবিতা যেমন, তেমন গল্পও, ঢাকার পত্রিকাতে পাঠিয়েছি, কলকাতার পত্রিকাতেও। দুটো একটা ছাপাও হয়েছে। মনে পড়ে কলকাতার নতুন সাহিত্য পত্রিকায় গল্প ছাপা হয়েছিল, আর ঢাকার ইত্তেহাদ পত্রিকার সাপ্তাহিক সাহিত্যের পাতায় গল্প। তখনও লেখক বা কবি কারো দলেই পরিচয় হয়নি। তা হলো ১৯৫৫-তে যখন ঢাকায় এমএ পড়তে এলাম।

বাংলা বিভাগের একাধিক ছাত্রের তখন লেখক কবি-সাংবাদিক হিসেবে বেশ নাম যশ। তাদের তুলনায় আমার অবস্থা ছিল একেবারেই নগণ্য। কিন্তু তবু লেখালেখির সূত্রে আহসান হাবীব, হাসান হাফিজুর রহমান এবং সিকান্দার আবু জাফরের সঙ্গে পরিচিত হই এবং তাঁদের স্নেহ লাভ করি। তাঁরা আমার ওই সময়ের কাঁচা লেখাও পড়তেন এবং আমাকে আন্তরিকভাবে উৎসাহ দিতেন। আমার লেখা ওরা নিজে যেমন প্রকাশ করেছেন তেমনি অন্য সম্পাদকদের ছাপাবার জন্য বলেছেন। আর এইভাবেই আমার লেখক পরিচয়টা জানাজানি হয়ে যায়।

আসলেই আমি লেখক হতে পেরেছি কি না তা অবশ্য এখনও আমি জানি না।

২০০০ : লেখালেখির শুরুর দিকে কথাসাহিত্যে আপনার আদর্শ কে ছিলেন? কার কার রচনা আপনাকে অনুপ্রাণিত করতো? পরবর্তীকালে কি আপনার সেই সাহিত্যবিবেচনায় কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে?

শওকত আলী : কথাসাহিত্যে আদর্শ লেখক বলে কি কোনো সৃজনশীল লেখক থাকে? আমার মনে হয় না। একজন সৃজনশীল লেখকের লেখা একবার পড়লেই পড়া শেষ হয় না কারণ ঐ লেখা যতোবার পড়া যায় ততোবারই নতুন কিছু পাওয়া যায়- আর সেই নতুন জিনিসটা ভালো লাগতে পারে আবার খারাপও লাগতে পারে। আর আদর্শ শব্দটার একেবারে নিষ্কলুষ ভালো। যাকে কোনো লেখার জন্য মাথায় তুললাম, আবার তার অন্যকোনো লেখা পড়ে মনে কষ্ট লাগে অথবা হতাশ হই। তাই সৃজনশীল মানুষের সৃষ্টি মাত্রই

একজন সৃজনশীল লেখকের লেখা একবার পড়লেই পড়া শেষ হয় না কারণ ঐ লেখা যতোবার পড়া যায় ততোবারই নতুন কিছু পাওয়া যায়- আর সেই নতুন জিনিসটা ভালো লাগতে পারে আবার খারাপও লাগতে পারে। আর আদর্শ শব্দটার একেবারে নিষ্কলুষ ভালো। যাকে কোনো লেখার জন্য মাথায় তুললাম, আবার তার অন্যকোনো লেখা পড়ে মনে কষ্ট লাগে অথবা হতাশ হই

আদর্শ হতে পারে না। কৈশোর বা যৌবনের প্রথম দিকে যাদের লেখা পড়তাম তাদের মধ্যে অনেকের লেখাই মনকে দখল করে নিতো কিন্তু সেই দখল স্থায়ী হতো না। বনফুলের গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়েছি একরকমের তো সুবোধ ঘোষের গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়েছি অন্যরকমের। তারাশঙ্করের উপন্যাসে সাঁতার কেটেছি তো বিভূতিভূষণের উপন্যাসে ডুবসাঁতার কাটতে হয়েছে দুটোই সানন্দ সন্তরণ। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস পড়ার সময় তো দুপুরের ঠা ঠা রোদে হাঁটতে হাঁটতে সোনা রূপো কুড়িয়েছি। সর্বত্রই অভিজ্ঞতা নতুন থেকে নতুনতর। কাকে আদর্শ বলে মাথায় তুলবো? তুলতে হলে সবাইকে মাথার ওপরে তুলতে হবে আর অতো ভার মাথায় নিয়ে কি পথ চলা যায়? যদি ঘাড় ভেঙ্গে যায়? তাই আদর্শ বলে কাউকে গ্রহণ করতে পারি নি। বরং বলা যায় পথের সন্ধান দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের পথ সন্ধান একেকজনের একেক দিকে। তাতে মুশকিল আরও বেশি। কার দেখানো পথে চলবো? তাই নিজের পথ খুঁজে সেই পথে চলার চেষ্টা করেছি। সেই পথে চলে কোথাও পৌঁছুতে পেরেছি কি না জানি না।

২০০০ : মুক্তিযুদ্ধকালে আপনি কোথায় ছিলেন? আপনার অনুভূতি কিরকম ছিল? তাৎক্ষণিকভাবে গণহত্যার কোনো সাহিত্যিক প্রতিবাদের উদ্যোগ কি গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল?

শওকত আলী : মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেকের মতো আমিও ঢাকাতেই ছিলাম। একেবারে শুরুতে অর্থাৎ ২৭ মার্চে ঢাকা ছেড়ে সপরিবারে বিক্রমপুরে ছোট ভাই ওসমানের শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় নেই। ২০/২৫ দিন থাকার পর আবার ঢাকায় ফিরে এসে নতুন বাসা ভাড়া করে বসবাস আরম্ভ করি। আবার যুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে ১৪ই ডিসেম্বর সপরিবারে ঢাকার বাইরে যাই, এবার সম্বন্ধীর শ্বশুরবাড়ি শ্রীনগরে। বেশিদিন থাকতে পারি নি, বিজয়োৎসব দেখার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠেছিলো, তাই ১৮ তারিখেই ফিরে আসি। পাকিস্তানের সৈন্যদের আক্রমণ দেখেছিলাম ২৫ শে মার্চের রাতে আবার ২৬ শে মার্চের সকালে। তার ফলে সন্ত্রস্ত ছিলাম, বিভ্রান্ত ছিলাম। বেঁচে থাকার চেষ্টাটাই প্রধান হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় ঢাকা ছেড়ে যাবার আগে পর্যন্ত মনের মধ্যে প্রতিরোধের চেতনা সজাগ যেমন ছিলো, তেমনি সক্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, সাধ্যমতো সাহায্যের চেষ্টা করেছি। উদ্বেগ ছিলো দিনাজপুর মানে বাড়ির খবর পাচ্ছিলাম না বলে। পরে খবর পাই যে বর্ডারের ওপারে কেউ কেউ ওদের দেখেছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে বাবাকে দেখেনি। উনি নাকি বর্ডারের ওপার যাননি। ১৬ই ডিসেম্বরে খবর পাই যে, বাবা পালিয়ে যেতে চান নি। যারা তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য বোঝাতে গিয়েছিলো তাদের তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন কতোবার বাড়িঘর ছেড়ে পালাবো, তোমরা যাও। আমি যাবো না। পাকিস্তান আর্মির মুখোমুখি হতে চাই আমি। পাকিস্তান আর্মি বাড়ির পাশের রাস্তায় গুলি করে মারে। না, সাহিত্যিক প্রতিবাদ যুদ্ধের সময় কীভাবে সম্ভব হতো? তখন তো পাকিস্তানের দালালরা লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের খুঁজে বেড়াচ্ছে রেডিও টিভিতে পাকিস্তানের সপক্ষে কথা বলাবার জন্য। আর যুদ্ধ শেষ হলে তো প্রতিবাদ তো পথে পথেই করা হচ্ছে। জনগণের সঙ্গে তখন লেখক, কবি, শিল্পীরাও ছিলেন। সাহিত্যিক প্রতিবাদ মানে নিশ্চয়ই সাহিত্য রচনার মাধ্যমে প্রতিবাদ। যা তাৎক্ষণিক ভাবে অনেকেই করেছেন। বিশেষ করে কবিরা কিন্তু অল্প কিছুদিন পরে প্রায় সবাই করেছেন। আমিও গল্প লিখেছি, উপন্যাসে হাত দিয়েছি যেটা কিছু পরে প্রকাশিত হয়েছে।

২০০০ : মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আপনার লেখক জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল?

শওকত আলী : হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই হয়ে উঠেছিলো, বলা যায় এখনও হয়ে রয়েছে। অনেকেরই জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে। বাঙালির জাতীয়তার উপলব্ধি ও পরিচয়টি সুস্পষ্টতর হয়েছে এবং শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে শিকড়সন্ধানী হয়ে উঠেছেন। অবশ্য ওটা শুরু হয়েছিলো ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকেই কিন্তু তখন এতো জোরালো ছিলো না। এখন যেমন জনগণের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে অতীতের বহু বিদ্রোহ এবং যুদ্ধকে যুক্ত করে দেখার চেষ্টা হচ্ছে আগে সে ভাবে দেখা হতো না। দেখা হতো বিচ্ছিন্ন ভাবে।

২০০০ : অনেকেই বলেন যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড় মাপের কথাসাহিত্য এখনও রচিত হয়নি। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

শওকত আলী : বড় মাপের সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? যদি কালজয়ী সাহিত্য বোঝানো হয় তাহলে একটা জাতির জীবনে ৩০/৪০ বছর খুব একটা বেশি সময় নয়। আর যা রচনা হয়েছে

তার মধ্যে কি কিছুই কালজয়ী হতে পারে না? এ প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। সাহিত্য রচনায় বিষয় এবং অনুপ্রেরণা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব তো মোটেও হ্রাস পায়নি বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনও তো মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড় কিছু এবং ভালো কিছু লেখার আশা অনেক লেখকই মনের ভেতরে লালন করেন।

২০০০ : আপনার একটি বহুল আলোচিত উপন্যাস 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'। এই উপাখ্যান কীভাবে লিখলেন– এব্যাপারে পাঠকদের কৌতূহল রয়েছে। কিছু জানাবেন কি?

শওকত আলী : প্রদোষে প্রাকৃতজন-এর উপাখ্যান রচনার পেছনে কাজ করেছে আমার দেখা ১৯৭১-এর ঘটনাবলী। ঐ সময় দলে দলে মানুষ শিশু বৃদ্ধ নারীপুরুষ মাথায় বোঝা নিয়ে চলছে আশ্রয়ের সন্ধানে। এমন দৃশ্য যেমন চোখে পড়েছে, তেমনি আবার এমন দৃশ্যও চোখে পড়ছে যে রাতের বেলা লণ্ঠনের আলোয় চারদিকে তরুণরা বসে শত্রু হননের পরিকল্পনা করছে। ঐ সব দৃশ্য মনের ভেতরে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে– কতকাল ধরে শাসিত নিগৃহীত মানুষকে এইভাবে নিজ বাসভূমি ত্যাগ করতে হয়েছে। শত্রুর অস্ত্রাঘাতে প্রাণ দিয়েছে আবার একই সঙ্গে প্রতিরোধ সংগ্রামও এগিয়ে নিয়ে গেছে। কতোকাল ধরে এদেশের মানুষ অর্থাৎ তৃণমূলের মানুষ বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে? শুধু কি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নাকি মোগল শাসনের সময়? নাকি তারও আগে, সেনদের ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন কালে বা তুর্কি শাসনামলে? তারও আগে শশাঙ্কের হত্যাযজ্ঞের ঘটনাও তো ইতিহাসে লেখা রয়েছে। কিংবা অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তারের সময়? মনের ভেতরে জেগে উঠতে থাকা প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্য কিছু পড়াশোনা করতে হয়। একই সঙ্গে সেই সব প্রাচীন সংগ্রামের ভূমিতে যেতে হয়েছিলো। এসব ঐতিহাসিক এলাকায় ঘোরা ফেরা প্রাচীন নিদর্শনাদি দেখা আর পড়াশোনা এসবেরই সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে উপন্যাসখানির আবির্ভাব।

২০০০ : সম্প্রতি বহুল উচ্চারিত দুটি টার্ম হচ্ছে 'উত্তরাধুনিকতা' এবং 'যাদুবাস্তবতা'। কথাসাহিত্যে এদুটি বিষয় নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণের কথা বলুন।

শওকত আলী : উত্তর আধুনিকতা অভিধাটি শিল্প ও সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে যেভাবে ব্যবহার করা হয়, তা আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারি না, এটা আমার অক্ষমতার কারণেও হতে পারে। আধুনিকতার সঙ্গে জীবনের বাস্তবতা এবং ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বলে জানি। এখন যদি জীবনের বাস্তবতা থেকে উত্তরণ ঘটানো হয়, তাহলে থাকেটা কী, আমার ধারণায় আসে না। আর ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে যদি ছাড়িয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ব্যক্তির থাকেটা কী? তার অস্বিত্ব কি থাকে? উত্তর আধুনিকতা অভিধাটি দিয়ে বাস্তবতার মধ্যই কিছু বৈচিত্র্য সন্ধানের চেষ্টা বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবতাকে ত্যাগ করা বোঝানো হলে তো তা একেবারেই দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক সেই রকমই আধুনিকতার আর একটি ভিত হচ্ছে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য। সেটাও যদি 'উত্তর আধুনিকতা' ছাপিয়ে বা ছাড়িয়ে যেতে চায় তাহলে তা পৌঁছায় কোথায়? উত্তর আধুনিক লেখকদের কিছু লেখা হাতে এসেছে। কিন্তু খুব নতুন কিছু পেয়েছি বলে মনে হয় নি। বাস্তবতা আর অবাস্তবতার মাঝামাঝি একটা স্বপ্নকল্পনার মতো ব্যাপার বলে আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে শুধু এই আঙ্গিক দিয়ে মানুষের জীবনকে ধারণ করা সম্ভব হবে। জীবন ও জগৎকে ওই আঙ্গিক দিয়ে ধরা সম্ভব হবে। আর যাদুবাস্তবতার ব্যাপারটা তো মোটামুটি বোধগম্য। কারণ এটা বাস্তবতারই ব্যাপকতর উপলব্ধিজাত একটা ব্যাপার। এর প্রয়োগে শিল্পসৃষ্টিতে অবশ্যই নতুন মাত্রা যুক্ত হতে পারে।

২০০০ : নতুনদের লেখা কি আপনি পড়েন? নতুনদের লেখা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই।

শওকত আলী : নতুনদের লেখা কিছু কিছু পড়েছি এবং এখনও পড়ি কিন্তু বেশি না, দৃষ্টিশক্তি এবং শারীরিক অক্ষমতার কারণে। তবে একথা আমি সব সময়ই বলে থাকি যে নতুনদের দিকে আমাদের তাকাতে হবে এবং তাদের কাছেই আমাদের আশা এবং বঞ্চনার কথা পৌঁছে দিতে হবে। কারণ তারাই তো নতুন দিগন্তের দুয়ার খুলে দেবে।

২০০০ : অনেক লেখকেরই নিজের লেখা কোনো একটি উপন্যাস সম্পর্কে দুর্বলতা থাকে। আপনার কি আছে? একই সঙ্গে জানতে চাইছি আপনি নিজে আপনার কোন লেখাগুলোকে খুবই গুরুত্ব দেন?

শওকত আলী : প্রকাশের পর সব উপন্যাসের ব্যাপারেই মনে হতো, একটা কাজ শেষ পর্যন্ত করেছি। এখনো এমনই মনে হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে আর তেমন মনে হয় না, অনেক উপন্যাসের নাম পর্যন্ত স্মরণ করতে পারি না। বোধহয় বার্ধক্যের জন্য। তবে পেছনে তাকিয়ে যখন দেখি, তখন মনে হয় না যে কোনো লেখা আমি অহেতুক লিখেছি। আসলে সব লেখারই, আমি মনে করি, কিছু না কিছু গুরুত্ব আছে।

২০০০ : আপনার লেখা কাহিনী নিয়ে নাটক হয়েছে। আপনি নিজে টিভিনাটক বা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখার কথা কি কখনও ভেবেছেন? সাহিত্য নিয়ে নাটক বা সিনেমা হওয়া প্রসঙ্গে কিছু বলুন। এর ফলে সাহিত্যের পাঠক কি কমে যায়?

শওকত আলী : হ্যাঁ, আমার উপন্যাস আর গল্প অবলম্বনে টিভি নাটক হয়েছে- সিনেমাও হয়েছে। কিন্তু সেসবের প্রশংসা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। না, টিভি নাটক বা চলচ্চিত্রের কাহিনী বা চিত্রনাট্য লেখার কথা সিরিয়াসলি ভাবি নি, এখনও ভাবি না। আমার সন্দেহ হয়, ও ধরনের কাজ আমাকে দিয়ে বোধহয় হবে না। আর টিভি বা সিনেমা গল্পের বা উপন্যাসের পাঠক কমিয়ে দেয় এটা বলা যায় না। ইংল্যান্ড বা আমেরিকার বইয়ের বাজারে একটু খোঁজ নিলেই তা বোঝা যাবে।

২০০০ : লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতা বা কমিটমেন্টের কথা আমরা বলে থাকি। আপনার লেখালেখির নেপথ্যে এই ব্যাপারটি কিভাবে ক্রিয়াশীল?

শওকত আলী : সামাজিক দায়বদ্ধতা তো আসলে জীবনের কাছেই দায়বদ্ধতা। ওটা প্রকৃত লেখক-শিল্পীর স্বভাবের ভেতরেই থাকে বলে আমি মনে করি।

২০০০ : সারাজীবন লেখালেখিতে নিয়োজিত নিবেদিত থাকলেন। কখনো আপনার মনে এমন প্রশ্ন আসে কিনা যে গণদারিদ্র্যের এই দেশে বেশির ভাগ বঞ্চিত সাধারণ মানুষের কাছে এইসব লেখালেখির কার্যকারিতা কতখানি?

শওকত আলী : এখানে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। তা হলো দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা থাকলে মানুষের দেহ এবং মন দুইয়েরই পূর্ণ বিকাশ হয় না। দেহমনে পূর্ণভাবে বিকশিত মানুষকে শোষণ যেমন করা যায় না, তেমনি শাসনও করা যায় না। তাই বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর ওপর সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও আধিপত্য নেই, তারা নিজেরাই সাম্রাজ্যবাদী অথবা আধিপত্যবাদী শক্তি হয়ে বিরাজমান। তাই অনুন্নত দরিদ্র দেশের মানুষদের দেহমনের বিকাশের কথা ভাবতে হবে। দেহকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য খাদ্য আর মনকে বিকশিত করার জন্য চাই জ্ঞান- যার একটা বড় অংশ সাহিত্য। তাই দেশ যতো দরিদ্রই হোক, সাহিত্য রচনার পথ থেকে সরে যাওয়া মানে শোষণকে অব্যাহত হতে দেওয়া ছাড়া অন্যকিছু নয়। তাই আমি মনে করি বই পড়ার অভ্যাসকে যেমন বাড়িয়ে তোলা দরকার, তেমনি দরকার সাহিত্যচর্চাকেও বাড়িয়ে তোলা। তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো ফল পাওয়া যাবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্যই সুফল পাওয়া যাবে।

২০০০ : তিনটি উপন্যাস একত্রে দুই মলাটের ভেতরে আপনি বন্দি করেছেন বার বার। সেই 'দক্ষিণায়নের দিন' থেকে হাল আমলের 'নাঢ়াই' পর্যন্ত। 'নাঢ়াই' তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা। আমরা লক্ষ্য করেছি যে তিনটি বই একসঙ্গে এক নামে বেরুলেও তার ভেতরে বিষয়বস্তু বা বক্তব্যগত সাযুজ্য সব সময়ে থাকে না। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করবেন?

শওকত আলী : ট্রিওলজির মধ্যে যদি পাঠক একটার সঙ্গে অন্যটার সাযুজ্য খুঁজে না পায় তাহলে সেটা লেখকেরই ব্যর্থতা বুঝতে হবে– প্রকাশিত গ্রন্থের ব্যর্থতা সংশোধনের কি উপায় আছে?

২০০০ : গ্রন্থ-বাজারের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে এখন ফিকশনেরই প্রাধান্য, ছোটগল্পগ্রন্থ খুব কমই বেরোয়। প্রতিষ্ঠিত লেখকরাও সাহিত্যের এই শাখাটিতে আগের মতো আর সময় দেন না। এরকম একটা অবস্থায় ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ কি?

শওকত আলী : রোমান্স ফিকশনের প্রাধান্য আজকাল সব দেশেই দেখা যায়। তাই ও নিয়ে ভাবনাচিন্তার দরকার আছে বলে মনে হয় না। কারণ যারা গল্প লেখার লেখক তাঁরা ঠিকই গল্প লিখবেন আর যাঁরা গল্পের পাঠক তাঁরাও ঠিকই পড়বেন। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা তো বেড়েই চলেছে। গল্পের বই বেশি সংখ্যায় না বেরুলে কী হবে, পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলোতে তো কম গল্প থাকে না।